Bangladesh Journal of Political Economy

Research Note-6

© 2017 Bangladesh Journal of Political Economy
Vol. 31, No. 5, January 2017, pp. 521-532
Bangladesh Economic Association
(ISSN 2227-3182)

ভবদহ ও সংলগ্ন এলাকার জলাবদ্ধতার গতি প্রকৃতি ও সম্ভাব্য সমাধান সূত্র

অনিল বিশ্বাস*
মো. রবিউল ইসলাম*

সারকথা: *ভবদহ ও সংলগ্ন এলাকার জলবদ্ধতা সমস্যা এ অঞ্চলের দীর্ঘ্যদিনের এক অনিবার্য নিয়তি হয়ে দাঁড়িয়েছে। ৮০'র দশকের মাঝামাঝি থেকে বর্তমান পর্যন্ত এ সমস্যার বিস্তৃতিকাল। হাজার হাজার হেক্টর কৃষি জমি এবং কয়েকটি উপজেলার লক্ষ লক্ষ মানুষ এ সমস্যায় জর্জরিত। ফসল থেকে আবাসভূমি, খাদ্য থেকে শিক্ষা ও চিকিৎসা, পরিবেশ, প্রতিবেশ এক কথায় এ অঞ্চলের সবকিছুই এর দ্বারা আক্রান্ত।সমস্যাটির উদ্ভব-বিকাশ, প্রতিবিধানের দৃষ্টিভঙ্গি, গৃহিত পদক্ষেপ সমূহের ঐতিহাসিক পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন এবং তাদের ত্রুটি ও সীমাবদ্ধতা ইত্যাদি চিহ্নিত করে সমস্যাটির সমাধানের পথনির্দেশের সুপারিশসমূহ এখানে তুলে ধরারই প্রবন্ধের প্রধান উদ্দেশ্য। সমস্যাটি ক্রুগ মিশনের (১৯৫৪ সালে তদানিন্তন যুক্তফ্রন্ট সরকারের অনুরোধে আগত বিশ্বব্যাংকের পরামর্শক ইউএস আর্মীর ইঞ্জিনিয়ারিং কোরের জেনারেল মি. ক্রুগের নেতৃত্বে পরিচালিত মিশন) বন্যা ও লবনাক্ততা নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রনিত সুপারিশ অনুসারে 'কর্ডন পদ্ধতি'(যার মূল কথা হ'ল, নদীর দুইপাড়ে উচুঁ বাঁধ দিয়ে নদীর পানিকে নদীতে রাখতে হবে; সাথে সাথে উপকুল ও নিকটবর্তী অপেক্ষাকৃত নিচু এলাকার চারিদিকে ভেড়ি বাঁধ তৈরি করে জোয়ারের পানি তথা লবণাক্ততা থেকে জমিকে রক্ষা করতে হবে।) বাস্তবায়নের পরিনতিতে উদ্ভূত হয়েছে। ২১০ কোটি মার্কিন ডলারের (১৯৬৪ সালের হিসাব) এ প্রকল্প বাস্তবায়নের সময়কাল ছিল ১৯৬৫-১৯৮৫ এই বিশ বছর। অর্থাৎ ভবদহ ও সংলগ্ন অঞ্চলের জলবদ্ধতার সমস্যা কোন প্রাকৃতিক দূর্যোগ নয় বরং এ হলো গণবিচ্ছিন্ন, অদূরদর্শী, তথাকথিত উন্নয়ন পরিকল্পনার নামে পরিবেশ প্রতিবেশের সাথে সংগতিহীন মানবীয় দায়িত্বজ্ঞানহীন জবাবদিহিতাবিহীন কর্মকান্ডের একটি ভয়ংকর বিষময় ফল।দৃষ্টিভঙ্গিগত সমস্যা থাকায় এ সমস্যরা সমাধানে গৃহীত পানি উন্নয়ণ বোর্ডের এতদিনের পদক্ষেপ ও প্রকল্পসমূহ শেষ পর্যন্ত কার্যকরি কোন সমাধান দিতে পারেনি। বরং তা সমস্যার ঘনত্বকে ক্রমান্বয়ে আরো তীব্র থেকে তীব্রতর করে তুলেছে। তাই বিগত তিনযুগেরও অধিক সময় সমস্যাটি সমাধানে বহু কোটি টাকা বরাদ্দ ও ব্যায় করা হলেও এ অঞ্চল জলাবদ্ধতার সমস্যার ক্ষেত্রে যে তিমিরে ছিল সেই তিমিরেই রয়ে গেছে। ভুক্তভুগি মানুষের দীর্ঘ্যকালিন জ্ঞান পরম্পরা ও বাস্তব অভিজ্ঞতাভিত্তিক জ্ঞানকাঠামোকে বিবেচনায় রেখে সমস্যা সমাধানের প্রতিবন্ধকতাসমূহ চিহ্নিত করে এ সমস্যা সমাধানের জন্য সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি, আশু করণীয়, মধ্যমেয়াদী করণীয় ও স্থায়ী করণীয় সম্পর্কে বেশকিছু সুপারিশও এখানে তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে।*

১. প্রারম্ভিক কথা : বিগত সাড়ে তিন দশকে (১৯৮১ থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত) ভবদহ এবং সংলগ্ন অঞ্চলসমূহের জলাবদ্ধতার সমস্যা নানা ভাবে ও নানা কারণে সমগ্র জাতির কাছে পরিচিতি পেয়েছে।

* আহ্বায়ক, কপোতাক্ষ বাঁচাও আন্দোলন এবং সহযোগী অধ্যাপক, দর্শন, নড়াইল সরকারি ভিক্টোরিয়া কলেজ

ভবদহ অভয়নগর উপজেলার টেকা নদীর পাড়স্থ একটি স্থান, যেখানে শ্মশান বিদ্যমান। 'ক্রুগ মিশনের নীল-নকশানুসারে 'কর্ডন পদ্ধতিতে বন্যা ও লবণাক্ততা দূরীকরণের' প্রকল্প বাস্তবায়নের পরিণতিতে দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে ভেড়িবাধের মধ্যস্থ ৩৭ টি পোল্ডারের ২৪ নং পোল্ডারের প্রধান স্লুস্স গেট (পাশাপাশি ২১ ভেন্ট ও ৯ ভেন্ট) এখানে স্থাপিত হওয়ার পর (ভবদহ গেট ২ টি টেকা নদীর উপর স্থাপিত সত্য, তবে গেটের দক্ষিণ অংশে বা ভাটিতে নদীটি টেকার পরিবর্তে শ্রী নামে পরিচিত) তা ভবদহ গেট নামে পরিচিতি পায় এবং ২৪ নং পোল্ডারের অন্তর্গত সমগ্র অঞ্চল ভবদহ অঞ্চল নামে চিহ্নিত হয়। যশোরের অভয়নগর, মণিরামপুর এবং কেশবপুর উপজেলার অংশ বিশেষ নিয়ে এ পোল্ডারের বিস্তৃতি। অপরদিকে 'ভবদহ সংলগ্ন এলাকা' বলতে ২৫ , ২৬ ও ২৭ নাম্বর পোল্ডারের ভবদহ সংলগ্ন অঞ্চল সমূহকে বোঝানো হয়। ভবদহ পোল্ডারের প্রধান নদী মুক্তেশ্বরী যা যশোর শহরের পাশ দিয়ে উত্তর থেকে দক্ষিণে প্রবাহিত হয়ে ক্রমান্বয়ে টেকা, শ্রী ও হরি নাম ধারন করে প্রবাহিত হয়েছে। এ অঞ্চলে ৫৩ মতান্তওে ৫৭ টি বিল ও ৮০/৮৫ টি গ্রাম রয়েছে।

২. ভবদহ ও সংলগ্ন এলাকার জলাবদ্ধতার ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট : কয়েক লক্ষ (আনুমানিক ৮ থেকে ১০ লক্ষ) মানুষের জীবন-জীবিকার ক্ষেত্রে অবর্ণনীয় দুর্ভোগ সৃষ্টিকারী ভবদহ ও সংলগ্ন এলাকার জলবদ্ধতার সমস্যাটি কোনরূপ প্রাকৃতিক দুর্যোগ কিংবা আকস্মিক ঘটনা নয়; বরং এ হলো গণবিছিন্ন, অদূরদর্শী, তথাকথিত উন্নয়ন পরিকল্পনার ভয়ংকর বিষময় ফল। এক কথায় মনুষ্যসৃষ্ট দুর্যোগ। এ কারণে ভবদহ ও সংলগ্ন এলাকার জলাবদ্ধতার গতি-প্রকৃতি বোঝার জন্য এর পিছনের ইতিহাসটি জানা দরকার। এ ইতিহাস যেমন দীর্ঘ তেমনই বহুমাত্রিক। এর সূত্রাপাত ১৮৫৯-৬১ সালে আসাম-বেঙ্গল রেল লাইনের অংশ হিসাবে কলিকাতা-কুষ্টিয়া ১৭০ কি.মি রেল লাইন স্থাপনের সময়। লাইনটি মাথাভাঙ্গা নদীর পূর্ব তীর বরাবর স্থাপিত হওয়ায় ভৈরব, চিত্রা, নবগঙ্গা,কুমারনদী তথা বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে প্রবাহিত সকল নদনদীর উত্তরের উৎসমুখ বাধা পড়ে যওয়ায় পদ্মার পানিপ্রবাহ থেকে বিছিন্ন হয়ে যায়। কেবলমাত্র দর্শনা শহরের ১.৫ কি.মি. দক্ষিণে একটি অতি সংকীর্ণ রেলব্রীজের নিচে দিয়ে ভৈরবের একটি ক্ষীণধারা প্রবাহিত থাকে। (বর্তমানে নদীপ্রবাহ না থাকলেও রেলব্রীজটি আছে।)। ১৯৩৯ সালে দর্শনায় কেরু এন্ড কোম্পানির চিনিকল স্থাপনের অতি অল্প সময়ের মধ্যই ভৈরবের ক্ষীণধারার ক্যানেলটি ভরাট হয়ে পানি প্রবাহ বন্ধ হয়ে যায়। এ ভাবে ১৯৫০ দশকের মধ্যে দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের মূল নদী কাঠামো (River system), 'ভৈরব-কপোতাক্ষ নদী কাঠামো'টি (Bhairab – Kapataksha River system) উজানের পানি প্রবাহ তথা পাহাড়ী ঢলের পানি থেকে সম্পূর্ণ বিছিন্ন হয়ে পড়ে। দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলের (কুষ্টিয়া, চুয়াডাঙ্গা, মেহেরপুর, ঝিনাইদহ, মাগুরা, নড়াইল, যশোর, খুলনা, সাতক্ষীরা, বাগেরহাট জেলা) উপর্যুক্ত নদী-কাঠামো ভৈরব, মাথাভাঙ্গা, গড়াই-মধুমতি পদ্মার এ সকল শাখা নদী থেকে মিষ্টি পানির যোগান পেত। কুমার, নবগঙ্গা ও চিত্রা মাথাভাঙ্গা নদীর মাধ্যমে পদ্মার পানি পেত।অপরদিকে বেতনা, হরিহর, মুক্তেশ্বরী টেকা, হরি, শ্রী, গ্যাংরাইল, শোলমারি, ভদ্রা, বেগবতী, ব্যাঙ, ফট্কি, কালীগঙ্গা, রূপসা, দড়াটানা, খোলপটুয়া, আড়পাঙ্গাশিয়া, শিবসা, মর্জার, ঢাকি, কয়রা, মেনস, ইছামতি, কদমতলি, সাহেবখালি, কাক্শিয়ালি, মালঞ্চ ইত্যাদি নদনদী যে 'ভৈরব-কপোতাক্ষ নদী কাঠামো' (Bhairab-Kapataksha River System) গড়ে তুলেছিল তার মাধ্যমে কুষ্টিয়া থেকে সুন্দরবন পর্যন্ত মিষ্টি পানির প্রবাহ সঞ্চারিত হত। পদ্মার সাথে বিছিন্নতার ফলে সমগ্র নদী-কাঠামোটি ক্ষতিগ্রস্থ হয়; এর স্বাভাবিক মিষ্টি পানির প্রবাহ ধীরে ধীরে স্তিমিত হয়ে যায়। প্রথম দিকে এ সকল নদ-নদীতে উজানের অববাহিকার নিষ্কাশন এলাকায় (Catchment Area) ঝরে-পড়া বৃষ্টির পানি বর্ষা মৌসুমে খানিকটা উজানের স্রোত তৈরি করলেও তা যেমন নদীর স্বাভাবিক গতি বজায় রাখতে পারেনি; তেমনই পারেনি সমুদ্রের জোয়ারে উঠে আসা পানির লবণাক্ততাকে প্রতিহত করতে। পরিণতিতে নদীভরাট হয়ে তার

জলপ্রবাহ ও নিষ্কাসন ক্ষমতা কমে যায়, শুরু হয় নদী দখলের মহোৎসব, বাড়তে থাকে বন্যার প্রকোপ, ঘটে ব্যপক ফসলহানি। অপরদিকে উজানের স্রোত না থাকায় লবণাক্ততার এলাকা অনেক বেড়ে যায়। এ দ্বিবিধ কারণে দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলের সমুদ্র উপকূল সংলগ্ন এলাকা থেকে শুরু করে যশোরের অভয়নগর, কেশবপুর এমনকি সদর পর্যন্ত ব্যাপক ফসলহানি, প্রতিবেশ-পরিবেশের ব্যাপক ক্ষতি ও জীববৈচিত্র্য ধ্বংসের মুখে পড়ে। পঞ্চাশর দশকের শুরুতে ধারাবাহিকভাবে এ অঞ্চলে ব্যাপক বন্যা দেখা দেয় যা সমগ্র অঞ্চলের জীবনযাত্রাকে বিপর্যস্ত করে দেয়। এর প্রেক্ষিতে ১৯৫৪ সালে যুক্ত ফ্রন্ট সরকারের অনুরোধে জাতিসংঘের উদ্যোগে বিশ্বব্যাংকের পরামর্শক ইউ এস আর্মি ইঞ্জিনিয়ারিং কোরের জেনারেল মি. ক্রুগের নেতৃত্বে গঠিত কমিশন বন্যা ও লবণাক্ততা দূরীকরণের জন্য 'কর্ডন পদ্ধতি'-নির্ভর পরিকল্পনার প্রস্তাবনা একটি রিপোর্ট আকারে তদানিন্তন সরকারের কাছে জমা দেয়। এটি 'ক্রুগ মিশন রিপোর্ট' নামে পরিচিত। রিপোর্টটির মূল থিম হলো, **নদীর দুইপাড়ে উচুঁ বাঁধ দিয়ে নদীর পানিকে নদীতে রাখতে হবে; সাথে সাথে উপকূল ও নিকটবর্তী অপেক্ষাকৃত নিচু এলাকার চারিদিকে ভেড়িবাঁধ তৈরি করে জোয়ারের পানি তথা লবণাক্ততা থেকে জমিকে রক্ষা করতে হবে।** সরকার রিপোর্টটি গ্রহণ করে এবং রিপোর্টের সুপারিশ মোতাবেক ১৯৫৯ সালে পূর্বপাকিস্তান পানি ও বিদ্যুত উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ বা ই পি ওয়াপদা (East Pakistan Water & Power Development Authority- EP WAPDA) গঠন করে। নবগঠিত কর্তৃপক্ষ ইন্টারন্যাশেনাল ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানি (International Engineering Company-IEC) কে প্রধান পরামর্শক (Consultant) নিয়োগ করে। আইইকো'র সহায়তায় ১৯৬৪ সালে ইপিওয়াপদা 'মাস্টার প্লান' (Master Plan) নামে এক বিশাল বন্যা নিয়ন্ত্রণ পরিকল্পনা হাজির করে। ২১০ কোটি মার্কিন ডলারের (১৯৬৪ সালের হিসাব) এ পরিকল্পনা বাস্তবায়নের সময়কাল ছিল ১৯৬৫-১৯৮৫ এই বিশ বছর। এ পরিকল্পনঅনুসারে কয়েক হাজার কি.মি. ভেড়িবাঁধ একশোর অধিক পোল্ডার এবং অসংখ্য স্লুস্স গেট ও জলপ্রবাহ নিয়ন্ত্রক কাঠামোা তৈরির উদ্যোগ নেওয়া হয়। পরিকল্পনাটি উপকূলীয় বাঁধ প্রকল্প (Costal Embankment Projet-CEP-1,2) ১ম পর্যায় ও ২য় পর্যায় নামে দুটি প্রকল্পের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা হয়। উপকূলীয় বাঁধ প্রকল্প ১ম পর্যায় ১৯৬৭ সালে সমাপ্ত হয়। এ পর্যায়ে ৯২ টি পোল্ডার.৪০০০ কি.মি ভেড়িবাঁধ ও ৭৮০ টি স্লুস্স গেট নির্মাণ করা হয়। যার মধ্য্য দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলের (খুলনা যশোর অঞ্চল, ভবদহ ও সংলগ্ন এলাকা যার অন্তর্গত।) ১৫৬৬ কি.মি.ভেড়িবাঁধ, ৩৭টি পোল্ডার ও ২৮২টি ছোট বড় স্লুস্স গেট ছিল। অর্থাৎ 'ক্রুগ মিশন' পরিকল্পনায় নির্দেশিত পথে এ অঞ্চলের বন্যা ও লবণাক্ততার সম্যার সমাধান করার উদ্যোগ বাস্তবায়ন করাা হয়।

পরিকল্পনা বাস্তবায়নের প্রথম এক দশক প্রকল্প এলাকার কৃষি উৎপাদন যথেষ্ট পরিমাণে বৃদ্ধি পেলেও ১৯৭৬/'৭৭ সাল থেকে ক্রমান্বয়ে এ অঞ্চলের পরিবেশ প্রতিবেশ ও আর্থসামাজিক অবস্থার উপর এর ব্যাপক নেতিবাচক প্রতিক্রিয়াসমূহ সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে।

নিচে প্রধান প্রতিক্রিয়াগুলি দেখানো হ'ল :

পরিবেশের উপর প্রতিক্রিয়া :

১। নদী সমূহের জোয়ারের প্লাবন ভূমি (Tidal Prism) সঙ্কুচিত হয়ে পড়ে এবং সমগ্র নিম্নভুমি নদীবাহিত পলি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ায় নদীবাহিত সমগ্র পলি নদীবক্ষে সঞ্চিত হতে থাকে। যা অনেক নদীকে ভরাট করে ফেলার ফলে নদী হারালো তার নাব্যতা, অবরুদ্ধ হতে থাকলো পানি প্রবাহের পথ, শুরু হ'ল জলাবদ্ধতা।

২। স্বাভাবিক বন্যার পলি সঞ্চয়ন থেকে বঞ্চিত হওয়ায় কারণে ভুমির নিম্নগমন পূরণ প্রক্রিয়া বন্ধ হয়ে যাওয়ায় ভুমির স্বাভাবিক গঠন প্রক্রিয়া ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

প্রতিবেশের উপর প্রতিক্রিয়া :

১) মাছ ও সামুদ্রিক জীবের চারণক্ষেত্র সঙ্কুচিত হতে থাকে।

২) অনেক দেশীয় প্রজাতির ধানের বিলুপ্তি ঘটে।

৩) মিষ্টি পানির যোগান বন্ধ হয়ে যাওয়ায় সুন্দরবনের ব্যাপক ক্ষতি।

আর্থ সামাজিক প্রতিক্রিয়া :

১) জলবদ্ধতার ফলে কৃষি ব্যবস্থা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কৃষকরা বাস্তুচ্যুত ও পেশাচ্যুত হয়।

২) বৃহদাকারের চিংড়ী খামার গড়ে উঠার কারণে সাধারণ স্বল্প জমির মালিক গরিব কৃষক জমি হারাতে থাকে, নদী-নালা-খাল-জলাভূমিতে প্রভাবশালী ও সম্পদশালীদের অবৈধ দখল বাড়ে।

ক্রুগ মিশন প্রস্তানা ও বিশেষজ্ঞ মতামত: এ সকল প্রতিক্রিয়া আকস্মিক যেমন নয়, তেমনই অস্বাভাবিকও নয়। এ বিষয়ে অনেক পূর্বেই অনেক বিশেষজ্ঞ সতর্ক করেছেন। এ প্রসঙ্গে অধ্যাপক মহলানবীশের গবেষণার কথা বলা যায়। ১৯২২ সালের উত্তবঙ্গের প্রলয়ঙ্করী বন্যার প্রেক্ষিতে প্রেসিডেন্সী কলেজের ভূগোলের অধ্যাপক প্রশান্ত মহলানবীশ ১৯২৭ সালে প্রকাশিত সমীক্ষায় বলেন যে, **নদীতীর বরাবর বাঁধ তৈরি করে বন্যা ঠেকানোর প্রচেষ্টা কোন স্থায়ী সমাধান হতে পারে না। কারণ তাতে আবদ্ধ বন্যার পানিবাহিত পলি নদীবক্ষে সঞ্চিত হয়ে নদীতল ক্রমশঃ ভরাট ও উঁচু হয়ে যাবে। ফলে অবশেষে পানি আবার বাঁধ উপচে পড়বে এবং বন্যার প্রকোপ আগের তুলনায় বেড়ে যাবে। বিলের মত নিচু এলাকার চারিপাশে বাঁধ তৈরি করা হলে সেগুলিও খুব একটা উপকারে আসবে না। বরঞ্চ জলপ্রবাহের পথে বাঁধা সৃষ্টি করবে। মহলানবীশ মনে করেন যে, বন্যার প্রবাহকে দ্রুত বেরিয়ে যাবার পথ করে দেওয়াটাই হচ্ছে বন্যা নিয়ন্ত্রণের সুযোগ্য পন্থা। তাছাড়া অবাধে বন্যার প্রবাহকে চলতে দিলে পলিমাটি পড়ে নিচু এলাকাগুলো ক্রমশঃ ভরাট হয়ে উঠতে পারবে এবং তাতে বন্যার প্রকোপ কমবে।** পরবর্তীতে ষাটের দশকে মার্কিন বিশেষজ্ঞ জেনারেল হার্ডিন (Hardin) এবং ওলন্দাজ বিশেষজ্ঞ প্রফেসর থীস (Thijsse)ও অধ্যাপক মহলানবীশের অনুরূপ সতর্কবাণী উচ্চারণ করেন। ক্রুগ মিশন পরিকল্পনায় এ সকল সতর্ক বাণী'র কোন কিছুই বিবেচনা করা হয় নাই। তাই অচিরেই প্রমাণিত হয় 'ক্রুগ মিশন' পরিকল্পনা প্রসূত 'উপকুলীয় বাঁধ-প্রকল্পটি ছিল নিছক তাৎক্ষণিকতা প্রসূত, অদূরদর্শী এবং আত্মঘাতী। বাস্তব পর্যবেক্ষণ, ভৌগলিক পরিবেশ, প্রচলিত কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থার সম্ভাবনায় সংকট, আর্থ-সামাজিক কাঠামো, প্রাকৃতিক পরিবেশ প্রতিবেশ, জীববৈচিত্র্য ইত্যাদি দিকসমূহ গভীরভাবে বিশ্লেষণ এবং বিবেচনায় না নিয়েই পরিকল্পনাটি বাস্তবায়ন করা হয়।

তাছাড়া সমস্যা সমাধানের জন্য পরিবেশ ব্যবস্থাপনার দৃষ্টিভঙ্গির দিক থেকেও 'ক্রুগ মিশন' পরিকল্পনাটি যথাযথ ছিল না। পরিবেশ-ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে প্রধানতঃ মানবকেন্দিক প্রকৌশলগত দৃষ্টিভঙ্গী (Anthropocentric Engineering Approach-AEA) ও প্রতিবেশিক প্রযুক্তিগত দৃষ্টিভঙ্গী (Ecological Engineering Approach-EEA) নামে দু'টি দৃষ্টিভঙ্গী রয়েছে।

প্রথম দৃষ্টিভঙ্গীতে কাঠামোগত নির্মাণই প্রধান বিষয়; প্রকৃতি, পরিবেশ, প্রতিবেশ, ইত্যাদি বিষয় এখানে গুরুত্বহীন। এ দৃষ্টিভঙ্গী উন্নয়ন কর্মকাণ্ডকে প্রকৃতির সাথে খাপ খাওয়ানোর পরিবর্তে প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হয়।

দ্বিতীয় দৃষ্টিভঙ্গীতে কাঠামোগত নির্মাণের তুলনায় প্রকৃতির যাবতীয় উপাদানসহ উদ্ভিদ ও প্রাণিকুল অধিক গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত হয়। এ দৃষ্টিভঙ্গীতে উন্নয়ন কর্মকাণ্ড প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রণ নয়; বরং প্রকৃতির সাথে

কার্যকর অভিযোজনের উপর অধিক জোর থাকে।

বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিম উপকুলীয় অঞ্চলের মত জটিল ও স্পর্শকাতর পরিবেশ ও প্রতিবেশিক বৈশিষ্ট্যপূর্ণ অঞ্চলের জন্য উন্নয়নের প্রতিবেশিক প্রযুক্তিগত দৃষ্টিভঙ্গী যেখানে অপরিহার্য সেখানে 'ক্রুগ মিশন পরিকল্পনা'টি সম্পূর্ণ মানবকেন্দ্রিক প্রযুক্তিগত দৃষ্টিভঙ্গীতে প্রণীত, যা এ ক্ষেত্রে কোন অর্থেই যথাযথ দৃষ্টিভঙ্গী নয়। ।

যাহোক, তথাকথিত এ উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের পর ১৯৭৬/৭৭ সালে এ অঞ্চলের বিভিন্ন পোল্ডারে জলাবদ্ধতা সমস্যার প্রাথমিক অবস্থা দেখা দিতে থাকে ধীরে ধীরে। ১৯৮২ সালে ২৫ নং পোল্ডার (বিল ডাকাতিয়া) থেকে এক ভয়াবহ জলবদ্ধতা শুরু হয়ে একে একে ২৪,২৬ ,২৭ ও ২৮ নম্বর পোল্ডারের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে জলবদ্ধ প্রসারিত হয়। অন্যান্য অনেক অঞ্চলের মত ভবদহ অঞ্চলে সমস্যাটি ভয়াবহ আকার ধারণ করে। এ পোল্ডারের সবচেয়ে বড় অবকাঠামোগত স্থাপনা ভবদহ স্লুস্সগেটটি পরিণত হয় মরণফাঁদে। ফসলি জমি থেকে বাস্তভিটা, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে রাস্তা-ঘাট, চিকিৎসালয় থেকে উপসনালয় সবই জলাবদ্ধতায় আক্রান্ত হয়। জলাবদ্ধ সাধারণ মানুষ পানিউন্নয়ণ বোর্ডের কাছে আবেদন-নিবেদন করে ব্যর্থ হয়ে সংঘবদ্ধ আন্দোলনের দিকে অগ্রসর হতে থাকে। স্থানীয় রাজনৈতিক দল ও নেতৃত্ব মানুষের পাশে এসে দাঁড়ায়। এর ধারাবাহিকতায় ১৯৮১ সালে ভবদহ স্লুস্স গেটের কাছে স্থানীয় সকল রাজনৈতিক দলের (ডান ও বাম) এক সর্বদলীয় জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। যদিও এ ঐক্য বেশিদিন ধরে রাখা যায় নি। পরবর্তীতে ভুক্তভোগী স্থানীয় জনতা পানি নিষ্কাশন সংগ্রাম কমিটি গড়ে তোলে এবং তাদের উদ্যোগে স্থানীয় ও জেলা পর্যায়ে মতবিনিময় সভা, ডেপুটেশন, জনসভা, মানব বন্ধন, সড়ক রেলপথ অবরোধ, হরতাল প্রভৃতি কর্মসূচী চলতে থাকে। এ কমিটি ঢাকা জাতীয় প্রেস ক্লাবেও সেমিনার করে। স্থানীয় ও জাতীয় দৈনিকসমূহ বিষয়টিকে গুরুত্বের সাথে তুলে ধরে। শাসক দলগুলি ভোটের রাজনীতিতে বিষয়টিকে ব্যবহার করতে থাকেন। এগিয়ে আসে ছোট বড় অনেক বেসরকারি প্রতিষ্ঠান। মহামান্য রাষ্ট্রপতি, মাননীয় প্রধান মন্ত্রী, বিভিন্ন মন্ত্রীসহ রাষ্ট্রের কর্তাব্যক্তিরা এলাকা পরিদর্শন করেন। পানি উন্নয়ণ বোর্ড ও রাষ্ট্রীয় প্রসাশনের উপর চাপ বাড়তে থাকে। আক্রান্ত মানুষ ও আন্দোলনের সামনের সারির নেতারা বাস্তব অভিজ্ঞতা ও ইতিহাস পর্যালোচনা থেকে বুঝতে পারেন ভেড়িবাঁধ, পোল্ডার স্লুইসগেট এক কথায় কর্ডন পদ্ধতিই হলো এ অঞ্চলে জলাবদ্ধতা সমস্যার প্রধান কারণ। পানি উন্নয়ণ বোর্ড প্রাথমিকভাবে বিষয়টিকে তেমন একটা আমলে নেয়নি এবং পানি নিষ্কাশনের তেমন কোন কার্যকরি পদক্ষেপ ও তারা নেয়নি। কোন দেনদরবারে কাজ না হওয়ায় সংঘবদ্ধ জনতা পূর্ব ঘোষণা দিয়ে ১৯৯০ সালের ১৮ সেপ্টেম্বর ২৫ নং পোল্ডারের (বিল ডাকাতীয়া) বাঁধের ৪টি স্থানে কেটে দেয়। এর ফলে হামকুড়া নদীর সাথে বিল ডাকাতিয়ার পানি প্রবাহের সংযোগ পুনস্থাপিত হয়। মাত্র কয়েক সপ্তাহের মধ্যে হামকুড়া নদী ৪০/৫০ হাত গভীরতা প্রাপ্ত হয় এবং বিলের পানি নেমে যায়। অপরদিকে বিলে নিয়মিত জোয়ার ভাটা এবং পলি অবক্ষেপনের ফলে ১৯৯২ সালের মধ্যে ডাকাতিয়া বিলে প্রায় ৫০০০ একর জমি জলাবদ্ধতা মুক্ত হয়ে ফসল চাষের উপযোগী হয়। পাশের পোল্ডারের এ ঘটনা অন্যান্য স্থানের জনগণের উপর প্রভাব ফেলে । স্বল্প সময়ের ব্যবধানে আরো বেশ কিছু জলাবদ্ধ বিলের মানুষ বাঁধ কাটা লড়াইতে সক্রিয় অংশগ্রহণ করতে এগিয়ে আসে; একে একে ডহুরির এবং ভরতভায়নার বাঁধ কেটে দেয়। আন্দোলনের প্রধান শ্লোগান হয়ে ওঠে 'অবাধ জোয়ার- ভাটাই কেবল পারবে জলাবদ্ধতা দূর করতে।' বিল ডাকাতিয়ার এ সফলতা খুব বেশি দিন ধরে রাখা যায় নি। এ প্রসঙ্গে এডাবের এক প্রতিবেদনে বলা হয়, "বাঁধ কাটা পরবর্তী পরিস্থিতিতে উপযোগী সাংগঠনিক কাঠামোর অভাবে পলিকে পরিকল্পিতভাবে বিলের অভ্যন্তরে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হয় নি, সম্ভব হয়নি জোয়ারভাটা সৃষ্ট তাৎক্ষণিক অসুবিধাগুলিকে মোকাবেলা করার জন্য দুর্গত এলাকার জনগণকে সহযোগিতা করা। পানি উন্নয়ন

বোর্ডের দায়িত্ব ছিল জনগণের এই অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নিয়ে এই কার্যক্রমকে বাস্তবোচিত প্রকল্প প্রণয়ন ও তা বাস্তবায়ন করা। কিন্তু পানি উন্নয়ন বোর্ড এর বিপরীতে অবস্থান গ্রহণ করে। তারা প্রথমে জনগণের কাটা বাঁধ বন্ধ করে দেয়। ফলে হামকুড়া নদী আবার দ্রুত ভরাট হয়ে পড়ে। দেখা দেয় নতুন নতুন এলাকায় জলবদ্ধতা।"

ভবদহের জলাবদ্ধতার প্রকৃতি ও কারণ : ইতোপূর্বে দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলের জলাবদ্ধতার যে সাধারণ ইতিহাস ও প্রকৃতির কথা বলা হয়েছে ভবদহের ক্ষেত্রেও তা প্রযোজ্য। ভবদহে পানি উন্নয়ন বোর্ড নির্মিত ২৪ নং পোল্ডারটির (ভবদহ) মূল জলাধার ও জলনিষ্কাশন পথ হলো মুক্তেশ্বরী নদী যা উত্তর থেকে দক্ষিণ দিকে প্রবাহিত এবং যথাক্রমে মুক্তেশ্বরী, টেকা, শ্রী ও হরি নামে পরিচিত। এ নদীর প্লাবনভূমি (Prism) ও নিষ্কাশন এলাকা (Catchment Area) নিয়ে পোল্ডারটি গঠিত। উজানের স্রোতের সাথে বিচ্ছিন্ন এ প্রবাহকে নিয়ন্ত্রণ ও লবণপানির আক্রমণ থেকে বিলে ফসলি জমিকে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে টেকা ও শ্রী নদীর সংযোগ স্থলে ভবদহ নামক স্থানে ২১ ভেল্ট ও ৯ ভোল্টের দু'টি স্লুস্স গেট নির্মিত হয়। স্লুস্স গেটের মূল উদ্দেশ্য ছিল ভাটার সময় বিলের অতিরিক্ত পানিকে নদী পথে নিষ্কাশন এবং জোয়ারের সময় লবণপানিকে বিলে প্রবেশ করতে না দেওয়া। সাদামাঠা ভাবে খুবই সাধু উদ্দেশ্য কিন্তু বাস্তবে দেখা গেল এ নিয়ন্ত্রণ-কাঠামো তৈরির পর একদিকে স্লুস্স গেটের ভাটিতে অতিদ্রুত হারে নদীবক্ষে পলি অবক্ষেপিত হতে থাকে। (জাপানী ভূ-তত্ত্ববিদ উমিৎসুর মতে নদী বক্ষে স্বাভাবিক পলি সঞ্চয়ের হার ৪ সে.মি. অথচ হামকুড়া নদী যখন ভরাট হতে শুরু করে তখন প্রতিদিন নদীবক্ষে ৫ সে.মি. পলি অবক্ষেপিত হত। একটানা মাত্র ১৯ দিন গেট বন্ধ থাকায় শ্রী নদীতে ০.৯ মিটার পলি অবক্ষেপিত হতে দেখা যায়। এ নদী দু'টিতে পলি অবক্ষেপণের হার অস্বাবাভিক রকমের বেশি। এ অঞ্চলের অন্য নদীসমূহে বাৎসরিক ১১.৭৫ সে.মি. হারে পলি অবক্ষেপিত হয়ে থাকে।) নদীবক্ষে পলি অবক্ষেপণের ফলে নদী ভরাট হতে থাকল এবং অচিরেই পোল্ডারের অভ্যন্তরস্থ বিলের তলদেশ অপেক্ষা নদীবক্ষ (River Bed) অনেক উঁচু হয়ে গেল; ফলে নদীর পানি নিষ্কাশনের ক্ষমতা যেমন হ্রাস পেতে থাকলো, তেমনই গেটের পাশে ৬/৭ ফুট পলি জমে যাওয়ার পর গেট তার কার্যকরিতা হারালো। এ ভাবে ভবদহ স্লুস্সগেট জলনিষ্কাশনের পরিবর্তে জলাবদ্ধতার প্রধান কারণ হয়ে দেখা দিল। অপরদিকে পোল্ডারের অভ্যন্তরের নদী খালসমূহে স্বাভাবিক জোয়ারভাটার অভাবে ক্রমাগত ভরাট হয়ে নিষ্কাশন এলাকার জল নিষ্কাশনের অযোগ্য হয়ে গেল। অন্যদিকে পোল্ডারের অভ্যন্তস্থ প্লাবনভূমিতে ঘটলো আরো ভয়াবহ ঘটনা, এ অঞ্চলের ভূমি প্রকৃতি এমন যে, এখানে প্রতিবছর স্বাভাবিক কারণে (ভূমি-গঠন প্রক্রিয়ায়) ২ থেকে ৩ সে.মি. হারে ভূমির নিম্নগমণ (Earth Subsidence) ঘটে। (অবশ্য গবেষক ড. মনিরুল হকের মতে দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলের বিলের নিচু জলাভূমিতে 'ভমি বসে যাওয়া'র পরিমাণ বছরে ১০ মি.মি।) স্বাভাবিক বন্যায় প্লাবনরূমিতে ৪ সে.মি. পলি অবক্ষেপিত হয়ে ভূমির এ নিম্নগমনকে পূর্ণ করে প্রতি বছর ২ সে.মি. উঁচু করত। পোল্ডার নির্মাণের পর এ পলি অবক্ষেপণ বন্ধ হয়ে যায়। ফলে প্রতিবছর প্লাবনভূমির নিচু জমি আরো নিচু হতে থাকে এবং নদীর পানির স্বাভাবিক উচ্চতার তুলনায় নিচু হওয়ায় ঐ পানি আর নদী পথে নিষ্কাশিত হতে পারে না। ফলে শুরু হয় এক স্থায়ী জলাবদ্ধতা। এ অঞ্চলের বিলসমূহে অসংখ্য খাল ছিল ধীরে ধীরে তা যেমন ভরাট হয়েছে তেমনই প্রভাবশালী ব্যক্তিবর্গ তার অধিকাংশই অবৈধভাবে দখল করে নিয়েছে,এমনকি নদীতে বহুস্থানে আড়াআড়ি বাঁধ দিয়ে নদীও দখল করেছে। এসব কারণে ভবদহ পোল্ডারের অভ্যন্তরস্থ জল নিষ্কাশণ ব্যবস্থা (Drainage system) অকেজো হয়ে পড়েছে। ভবদহ অঞ্চল হয়ে ওঠে একটি স্থায়ী ও পুণঃপৌনিক জলাবদ্ধ অঞ্চল। ঘটনাটি একদিনে ঘটে নি। ১৯৭৫-৭৬ সালে প্রথমে মুক্তেশ্বরী নদীঅববাহিকায় অবস্থিত যশোর শহরের দক্ষিণাংশ সংলগ্ন বিল হরিণা, মণিরাপুর উপজেলার ঢাকুরিয়া ইউনিয়নের (বিলের নামটি লিখতে হবে)

বিলে জলাবদ্ধতা দেখা দেয়। পর্যায়ক্রমে প্রায় প্রতিবছর বর্ষা ঋতুতে জলাবদ্ধতার আয়তন বাড়তে থাকে এবং সেই সাথে বাড়তে থাকে এর আগ্রাসী রূপ। এ সময় থেকে স্থানীয় মানুষেরা মাছ ধরার জন্য নদীতে কোথাও পাটা দিয়ে, আবার কোথাও বাঁধ দিয়ে মাছ ধরতে শুরু করে, যা নদী প্রবাহের স্বাভাবিক গতি রোধ করায় পরিস্থিতিতির আরও অবনতি ঘটেএদের মধ্যে একদল অতিলোভী স্বার্থান্বেষী মানুষ সরকারি ভূমি অফিসের অসাধু নায়েব ও সেটলমেন্ট অফিসের কর্মচারি কর্মকর্তাদের সহযোগিতায় মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে ভূমির স্বাভাবিক চরিত্র বদলিয়ে মুক্তেশ্বরী নদীর খাদকে পরিত্যক্ত অথবা প্রাকৃতিক জলাশয় দেখিয়ে উন্নয়নের নামে, মৎস্য চাষের অছিলায়, কোথাও ভুয়া মৎস্য সমবায়ের নামে, কোথাও বা নিজেদেরকে মিথ্যা ভূমিহীন দেখিয়ে তাদের নামে জমি বরাদ্দ ও লিজ নিয়ে আড়াআড়ি বাঁধ দিয়ে নদী খাতকে পর পর একাধিক পুকুর ও দীঘির মতো করে মাছ চাষ করা শুরু করে। এমনকি কোন কোন স্থানে নদীকে ফসলি জমি হিসাবে ব্যবহার করতে শুরু করে। ঢাকুরিয়ার তারুয়াপাড়াতে এইরকম একাধিক ঘটনা তখন ঘটেছিল। আবার সতীঘাটা ব্রিজের নিচেয় বাঁধ দিয়ে মাছ ধরতে থাকে প্রভাবশালী স্বার্থান্বেষী ব্যক্তিরা। এসব নিয়ে একাধিকবার স্থানীয় পর্যায়ে মারামারি ও রক্তপাতের ঘটনাও ঘটেছে। ভবদহ গেট পর্যন্ত একাধিক জায়গায় একই ধরনের ঘটনা ঘটতে থাকে। মাঝখানে নদীর প্রবাহ বন্ধ হয়ে পড়ে। অববাহিকার বিলগুলিতে তীব্র জলাবদ্ধতা, ফসলহানি, চলাচলের অসুবিধা, খাদ্যাভাব। জন-অসন্তোষ মাথাচাড়া দিতে থাকে। আমরা ইতিহাস আলোচনায় দেখেছি এক দশক জলবদ্ধতার যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পাওয়ার উপায় হিসাবে ভুক্তভোগী সাধারণ মানুষ সব ধরনের বাঁধা ও রক্তচক্ষু পেরিয়ে সংঘবদ্ধ হয়ে পোল্ডারের বাঁধ কাটতে শুরু করে দেয়। এমন বাস্তবতায় পানি উন্নয়ন বোর্ড তাদের 'কর্ডন পদ্ধতি'কে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে ১৯৯২ সালে পোল্ডার সমূহকে অটুট রেখে এশিয়া উন্নয়ন ব্যাংকের সহায়তায় পানি নিষ্কাশনের জন্য ব্যাপক পরিকল্পনা গ্রহণ করেন।

প্রাক্কলিত খরচসহ পানি উন্নয়নবোর্ডের প্রস্তাবিত পরিকল্পনাসমূহ ঃ

প্রকল্পের নাম	কর্ম এলাকা	প্রাক্কলিত ব্যয়	মন্তব্য
CERP হাস্কনিং পরিকল্পনা ১৯৯৩ (উপকুলীয় বাঁধ পুনর্বাসন প্রকল্প)	১০০৬ বর্গ কিলোমিটার	২২৯ কোটি ৪৮ লক্ষ টাকা	নদীসমূহের উজানে ড্রেজিং, বিল কেদারিয়ায় জলাধার নির্মাণ, চুকনগরের কাছে নদীতে লুপকাট
সংশোধিত হাস্কনিং পরিকল্পনা ১৯৯৩	১০০৬ বর্গ কিলোমিটার	২৩৮ কোটি ২৭ লক্ষ টাকা	
FAP -4 হ্যালক্রো পরিকল্পনা	১৩০৬ বর্গ কিলোমিটার	২৮৬ কোটি ১৬ লক্ষ টাকা	টেবুনিয়ায় সালতা নদীতে খুব বড় একটি রেগুলেটর (১০০ মি. প্রস্থের ৪০ ভেল্ট) নির্মাণ, তেলিগাতী ও ভদ্রা নদীর ভাটিতে পানিপ্রবাহ বন্ধের ব্যবস্থা
পাউবো প্রকৌশলীদের প্রস্তাবিত পরিকল্পনা	১৩০৬ বর্গ কিলোমিটার	২৭৪ কোটি ১৬ লক্ষ টাকা	প্রস্তাবিত বড় রেগুলেটর টিটিয়াবুনিয়ার পরিবর্তে ঘেংরাইল নদীর আরো দক্ষিণে বসানোর কথা বলা হয়।
KJDRP -1	১০০৬ বর্গ কিলোমিটার	২১৬ কোটি ২৩ লক্ষ টাকা	টিয়াবুনিয়ার খুব বড় রেগুলেটর টিকে বিভক্ত করে টিয়াবুনিয়া ও খর্নিয়ায় স্থাপনের প্রস্তাব।
KJDRP -2	১১২৬ বর্গ কিলোমিটার	২৩৩ কোটি ২২লক্ষ টাকা	

প্রকল্প প্রস্তাবগুলি বিবেচনা করলে দেখা যাবে এদের সবগুলিই "পোল্ডারই মূলত সঠিক "পাউবো'র এ দৃষ্টিভঙ্গিকে অনুসরণ করে প্রণীত।

পরিকল্পনাগুলির মর্মকথা হল "প্রকল্প এলাকার বাইরে, দক্ষিণে বড় আকারের কয়েকটি স্লুইসগেট তৈরি

করা স্লুইস গেটের বাইরে পলি আটকিয়ে রাখা ।

ইমাজেন্সী এ্যাকশন প্লান ঃ হাস্কোনিন এন্ড এসোসিয়েটস কর্ত্তৃক উপকূলীয় বাঁধপূনর্বাসন প্রকল্পের সমীক্ষা চলাকালে খুলনা জেলার বিল ডাকাতিয়ার জলাবদ্ধতা দূর করার জন্যে ১৮/০৮/১৯৯৩ তারিখের এক অদাপ্তরিক স্মারকে অন্তবর্তীকালীন তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা হিসাবে 'ইমার্জেন্সী এ্যাকশন প্লান' (Emargency Action plan-EAP) গ্রহণ করা হয়। নিচে এর সংক্ষিপ্তসার দেওয়া হ'ল ঃ

ইমাজেন্সী এ্যাকশন প্লান ১৯৯২-৯৩

ক্রমিক	কাজের নাম	কাজের পরিমাণ	ব্যয় (লক্ষ টাকা)
১	জনগণের কেটে দেওয়া বাঁধ পুননির্মাণ	৪ টি স্থানে	৯৩.৬০
২	স্লুইসগেট মেরামত	৩ টি	৬.৪০
৩	ডাইভারসান খাল পুনঃখনন	৬.৩৯ কি.মি.	১০২.৮৫
৪	বিলের অভ্যন্তরীণ খাল পুনঃখনন	৪.০০ কি.মি.	৬.৪৫
৫	শোলমারী নদী ড্রেজিং	২.৪৬ কি.মি.	১৩৭.৮৯
৬	সংস্থাপন ও অন্যান্য	-------	৩.৪৯

ইমার্জেন্সী এ্যাকশন প্লান ১৯৯৩-'৯৪ : পদ্ধতিগত সমস্যার কারণে ১৯৯৩-'৯৪ তে কোন বাস্তব কাজ হয় নি।

এ্যাকশন প্লান ১৯৯৪-'৯৫ : ২৬২৫ লক্ষ টাকার সংস্কার কাজ পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত হলেও পরামর্শক নিয়োগ এশিয় উন্নয়ন ব্যাংকের সাথে চুক্তির শর্তমোতাবেক না হওয়ায় কাজ করা যায় নি। তবে ১৮/৮/৯৪ এর পর্যালোচনা সভায় খুলনা যশোর নিষ্কাশন পুনর্বাসন প্রকল্পের ১৯৯৪-'৯৫ সালের কর্মসূচীতে ভবদহ রেগুলেটরকে কার্যকর এবং ভবদহ এলাকার জলবদ্ধতা দূরীকরণের উদ্দেশ্যে ইমার্জেন্সী এ্যাকশন প্লান গ্রহণ করা হয়।

ইমার্জেন্সী এ্যাকশন প্লান ১৯৯৫-'৯৬ : ১৯৯৬ সালে কে,জে,ডি,আর,পি,র ইমার্জেন্সী এ্যাকশন প্লানের আওতায় ভদ্রা নদীতে ক্রসড্যাম নির্মাণের ফলে শ্রী নদী দিয়ে প্রচুর পলি এসে ভবদহগেটের মুখে জমা হয়। (যার পরিমাণ ছিল স্বাভাবিকের চেয়ে ৫ ফুট বেশি)।পরিণতিতে ভবদহ গেট পানি নিষ্কাশনে অকার্যকর হয়ে পড়ে, যে কারণে ১৯৯৬ সালে আগস্ট মাসে মাত্র তিনদিনের টানা বর্ষণে মণিরামপুর, অভয়নগর, কেশবপুর এবং ডুমুরিয়া উপজেলার ৬২ গ্রামের কয়েক লক্ষ মানুষ ভয়াবহ জলবদ্ধতার শিকার হয়। এ প্রেক্ষিতে ২৩-০২-'৯৭ তারিখে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এলাকা পরিদর্শনে এসে জনগণের দাবির প্রেক্ষিতে ভবদহ স্লুইসগেটের ভাটিতে হরিনদী পুনঃখননের নির্দেশ দেন ও প্রকল্প অতিরিক্ত দুই কোটি টাকা বরাদ্দ দেন। তদানুসারে হরি নদীর ৮.৬২ কি.মি. জনশ্রমে পুনঃখনন, ভাটিতে ২.৮৮ কি.মি. যান্ত্রিকভাবে পলি অপসরণ কাজ করা হয় এবং আরো ভাটি অঞ্চলে খর্নিয়া নামক স্থানে ড্রেজারের সাহায্যে পলি অপসরণের কাজ করা হয়। এদিকে ভদ্রা নদীতে ক্রসড্যাম দেওয়ার ফলে ড্যামের পিছনে ৮/১০ ফুট পলি জমে যাওয়ায় পরবর্তীতে ক্রসড্যাম উঠানোর পরও হরি নদীকে নাব্য করা যায়নি।

উপরের আলোচনায় দেখা যায়, ভবদহ জলাবদ্ধতা নিরসনে সরকারি উদ্যোগ ও অর্থব্যয়ে কার্পণ্য খুব একটা না থাকলেও সমস্যা সমাধানের সঠিক দৃষ্টিভঙ্গী ও জবাবদিহিতামূলক সুদূরপ্রসারী ও সমন্বিত পরিকল্পনার অভাবে কেবলমাত্র তাৎক্ষণিক স্বল্পকালীন কিছু সুবিধা ছাড়া সমস্যার স্থায়ী সমাধানের তেমন কোন অগ্রগতি হয় নি। তাই আজ ২০১৬ সালে এসে ২.১১.১৬ তারিখ মাত্র একটানা ৩৭ ঘন্টা এবং

সপ্তাহান্তে আরও ২৭ ঘন্টা একটানা বৃষ্টিপাতের ফলে যশোর জেলার দক্ষিণাংশ তথা মণিরামপুর, কেশবপুর, অভয়নগর ও যশোর সদর উপজেলার সমধিক শতকরা ৬০ ভাগ এলাকা ভবদহ জলাবদ্ধতার শিকার হয়ে পড়েছে। সরকারি হিসাবে তিন উপজেলার ৩০ ইউনিয়নের ১৫০টি গ্রামের ১লক্ষ ৫০ হাজার অধিবাসী জলাব্ধতার কারণে চরম দুর্ভোগের কবলে পড়ে মানবেতর জীবন যাপন করছেন। ৫০ লক্ষ হেক্টর দোফসলি এবং তিন ফসলি জমিতে কৃষিকাজ বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে। ৭০টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পানিত ডুবে গেছে। তার মধ্যে . . . .টি প্রাথমিক বিদ্যালয়, . . .টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়, . . . উচ্চ মাধ্যমিক ও ডিগ্রি কলেজ ও মাদ্রাসা পানিতে ডুবে থাকায় সেগুলি পাঠদানের অননোপযোগী হয়ে পড়েছে। জলনি-মগ্ন হয়েছে . . . .টি স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কেন্দ্র। এবং এই নির্দিষ্ট এলাকার পশ্চিমাংশ জুড়ে কপোতাক্ষ অববাহিকায় ঝিকরগাছা, মণিরামপুর ও কেশবপুর উপজেলার ১০ থেকে ১৫ শতাংশ আবাদি জমি জলাবদ্ধতার শিখার। তিন উপজেলার . . . টি পরিবার বাড়িতে টিকতে না পেরে নিকটস্থ কাঁচা পাকা সড়কে অস্থায়ী পলিথিনের তাবুতে বাস করছেন। সঙ্গে নিয়ে এসেছেন তাদের গৃহপালিত গবাদি পশু, ছাগল, হাঁস মুর্গি।

জলাবদ্ধতা নিরসনে ভুক্তভুগী জনগনের নিজস্ব উদ্ভাবন : পানিউন্নয়ন বোর্ডের প্রকল্পসমূহের ব্যর্থতার প্রেক্ষাপটে স্থানীয় জনগণ সমস্যা সমাধানের জন্য এ অঞ্চলের দীর্ঘদিনের প্রচলিত অস্টামাসী বাঁধের অভিজ্ঞতা থেকে বিলের জলাবদ্ধতা নিরসন ও ভূমি গঠনের সমন্বিত কার্যক্রম হিসাবে যে প্রস্তাবনা দেয় তা টি.আর.এম. (Tidal River Management-TRM) নামে পরিচিত। ১৯৯৮ সালের ২৪ শে জানুয়ারি মাসে যশোর জেলা পরিষদ মিলনায়তনে বামপন্থি আটটি কৃষক সংগঠন ও জেলার রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ একটি সেমিনারের আয়োজন করে। যেখানে ড.আইনুন নিশাত, ড. স্বপন আদনান, প্রকৌশলী মো. শহিদুল্লাহসহ দেশবরেণ্য পানি ও পরিবেশ বিশেষজ্ঞগণের উপস্থিতি ও সমর্থনে জোয়ারাধার প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। এটিই পরবর্তীতে টি.আর.এম. নামে পরিচিত হয়। জনগণের আন্দোলনের চাপে সরকার প্রস্তাবটি গ্রহণ করতে বাধ্য হয়। সিদ্ধান্ত হয় যে, পর্যায়ক্রমে বিল কেদারিয়া, বিল খুক্শিয়া এবং বিল কপালিয়ায় টি.আর.এম চালুকরা হবে। বিল কেদারিয়া ও বিল খুক্শিয়ায় তা চালু করা হয় এবং এলাকার জনগণ তার সুফল লাভ করে। এর ফলে টি.আর.এম. চালু হওয়ায় বিলের ভূমির উচ্চতা বৃদ্ধিপায় অপরদিকে জোয়ার ভাটার কারণে নদী সমূহের গভীরতা বেড়ে যায়। কিন্তু দেখা দেয় বেশ কিছু জটিলতা, যেমন জোয়ারাধার চলা কালীন বিলের ফসলের ক্ষতিপূরণের টাকা প্াওয়ার জটিলতা, গ্রাম রক্ষা বাঁধ নির্মাণ ত্রুটির (প্রধানত পাউবো'র দূর্নীতিবাজ কর্মকর্তাদের যোগসাজসে) কারণে গ্রামে পানি প্রবেশ, প্রভাবশালী ঘের মালিক ও নদী-খাল-জলা-জমি অবৈধ দখলকারীদের তীব্র বিরোধিতা ও নানামুখি ষড়ন্ত্র ইত্যাদি। এসব কারণে সিদ্ধান্ত থাকলেও বিল কপালিয়ায় টি.আর.এম আজও চালু করা যায়নি। ফলে ভবদহের জলাবদ্ধতা নিরসনের একমাত্র কার্যকরি পদ্ধতিটির ধারাবাহিকতা নষ্ট হয়ে স্থবির হয়ে পড়েছে। এর সাথে যুক্ত হয়েছে পাউবো'র দূর্নীতিবাজ প্রকল্প বিশারদ কর্মকর্তাদের অনীহা।

বিষযটি বোঝার জন্য বিল খুক্শিয়া ও বিল কপালিয়া জোয়ারাধারের টি.আর.এম. চলাকালীন সময়ের ক্ষতিপূরণের একটি হিসাব দেওয়া হ'ল

বিল খুকশিয়া

ক্রমিক	বিষয়	পরিমাণ
১	বিল খুক্শিয়ায় মোট জমি	১৩৭৩.৬৬ একর
২	ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকের সংখ্যা	১০৮২ জন
৩	এ পর্যন্ত ক্ষতিউরণের অর্থ পেয়েছেন	২৫৫ জন
৪	পাউবো কর্তৃক জেলাপ্রশাসনের কাছে হস্তান্তরিত টাকা	৩,৩৩,৯৯,০০০/=
৫	এ পর্যন্ত বন্টিত অর্থ	৯১,২৯,৫৪৭/=
৬।	বন্টন না হওয়া অর্থ	২,৪২,৬৯,৪৫৩/=

বিল কপালিয়া

ক্রমিক	বিষয়	পরিমাণ
১	বিল কপালিয়ায় মোট জমি	১৫৮৮.৪৩ একর
২	ক্ষতিগ্রস্ত মোট কৃষক	২৬৩৯ জন
৩	চেক প্রদান করা হয়েছে	১৬১ টি
৪	পাউবো কর্তৃক জেলা প্রশাসনের কাছে হস্তান্তরিত মোট টাকা	১৫,২৪,২৪,৭১৯/=
৫	বন্টনকৃত টাকা	৪০,৪৭,৬৫০/=
৬	অবন্টিত টাকা	১৪,৮৩,৭৭,০৬৯/=
৭	মোট এওয়ার্ডি সংখ্যা	২৬৩৯ টি
৮	মোট প্রাপ্ত আবেদন	১৯৮ টি
৯	দুই বছরে একর প্রতি ক্ষতি পূরণের পরিমাণ	৯৬,০০০/=

উপরের ছক থেকে সহজেই বোঝা যায়, ক্ষতিপূরণ দেওয়ার বিষয়টি আরো সহজ করা না গেলে এবং প্রকৃত কৃষক তার ক্ষতিপূরণের অর্থ না পেলে তারা টি.আর.এম. বাস্তবায়নে আগ্রহী যেমন হবে না, তেমনই ঘের মালিক ও অবৈধ দখলদারদের ষড়যন্ত্রের জালে পড়ে অতি সহজে বিভ্রান্ত হবে।

৪. অনুসিদ্ধান্ত

১। ভবদহ ও সংলগ্ন এলাকার জলাবদ্ধতার সমস্যার মূল কারণ দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের নদীব্যবস্থা (River System) এর সাথে উজানের মূল পানিপ্রবাহের সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণ এবং পরবর্তিতে ক্রুগমিশনের নীল-নকশা অনুসারে নানাপ্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে 'কর্ডন পদ্ধতি' প্রয়োগ ও স্থানীয় নদী প্রবাহের অবাধ জোয়ার ভাটাকে বাঁধাগ্রস্ত করণ।

২। এ অঞ্চলের ভুমি গঠন ও আন্তঃনদী সংযোগের গুরুত্বকে বিবেচনায় না নিয়ে বিবিধ প্রকল্প বাস্তবায়ন।

৩। পরিবেশ প্রতিবেশ ও জীববৈচিত্র্যের সাথে তথাকথিত উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের বৈপরীত্য।

৪। 'পোল্ডার ব্যবস্থাই সর্বোৎকৃষ্ট পন্থা' পানি উন্নয়ন বোর্ডের নীতিনির্ধারকদের এ চিন্তাগত অবস্থান

৫। সাধারণ মানুষের বংশানুক্রমিক ঐতিহাসিক জ্ঞান ও বাস্তব অভিজ্ঞতা প্রসূত অভিজ্ঞানকে বিবেচনায় না আনা।

৬। প্রকল্প প্রণেতাদের কোনরূপ জবাবদিহিতার আওতায় না আনা।

৭। নদী,খাল,জলাভুমি নানা অর্থে প্রভাবশালীদের জবরদখল ও অবৈধ ঘের স্থাপন।

ভবদহ ও সংলগ্ন অঞ্চলের জলবদ্ধতা সমস্যা নিরসনে আমাদের সুপারিশসমূহ :

ক। আশু করণীয়

১। জলাবদ্ধ এলাকাকে দুর্গত এলাকা ঘোষণা করে পর্যাপ্ত ত্রাণ ও পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা।

২। দ্রুততম সময়ে শ্রী ও হরি নদীতে খনন কাজ করে ভবদহের জল নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করা।এ ক্ষেত্রে দুর্নীতি রোধ ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে হবে।

৩। পানি উন্নয়ন বোর্ডের গৃহীত সিদ্ধান্ত মোতাবেক ভবদহ স্লুইস গেটের ২১ ও ৯ ভেরেটর মাঝখানের বাঁধ কেটে সরাসরি নদী-সংযোগ দিতে হবে।

৩। প্রয়োজনীয় গ্রাম প্রতিরক্ষা বাঁধের ব্যবস্থা করা।

৪। আমডাঙ্গার খালকে সোজাকরে কেটে প্রয়োজনীয় সংস্কার করে রাজাপুরের খালের সাথে সংযোগ দিতে হবে; যাতে মুক্তেশ্বরীর উজানের পানি এ খাল দিয়ে সরাসরি ভৈরবে পড়তে পারে।

খ। মধ্যমেয়াদী সমাধানের জন্য করণীয়

১। অস্টমাসি বাঁধের প্রচলন করে প্রথাগতভাবে জোয়ারের পানি প্রবাহিত পলিকে বিলে অবক্ষেপণের ব্যবস্থা করতে হবে।

২। টি.আর.এম. (Tidal River Management-TRM) ব্যবস্থাকে নিয়মিতভাবে চালু রাখতে হবে। এ ক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণসহ বিভিন্ন রকমের সমস্যা সমাধানে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

৩। নদীকাঠামোর নাব্যতা বজায় রাখার স্বার্থে নদীর উপর সকল ধরনের ক্রসড্যাম নির্মাণ থেকে বিরত থাকতে হবে এবং নির্মিত ক্রসড্যাম উঠিয়ে দিতে হবে।

৪। নদীর স্বাভাবকি গতিপথ সর্পিল তাই নদীর স্বাভাবিক প্রবাহকে বজায় রাখার স্বর্থে সকল ধরনের 'লুপকাট' পরিকল্পনা বর্জন করতে হবে।

৫। অবৈধ দখলদারদের হাত থেকে সকল নদী, খাল ও প্লাবনভূমি উদ্ধার করতে হবে।

গ। স্থায়ী সমাধানের জন্য করণীয়

১। মাথাভাঙ্গা নদীর সাথে চিত্রা নদীর সংযোগ স্থাপন করে ভৈরবের প্রবাহের সাথে তার সংযোগ স্থাপন করতে হবে।(বহু আন্দোলন সংগ্রামের পরিণতিতে সম্প্রতি বিষয়টি একটি প্রকল্প হিসাবে একনেকে পাশ হয়েছে)

২। ভৈরব-কপোতাক্ষ নদী কাঠামোকে পূণঃজাগরিত করার সমন্বিত পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করতে হবে। এ ক্ষেত্রে নদীসমূহের প্রয়োজনীয় খনন পূণঃখনন, স্বাভাবিক পানিপ্রবাহ অব্যহত রাখার জন্য নদীপথের সকল অপ্রয়োজনীয় প্রতিবন্ধকতা অপসারনের ব্যবস্থা করতে হবে। পাশাপাশি বর্ষা মৌসুমের পানির ও পলির পরিকল্পিত ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করতে হবে।

সহায়ক গ্রন্থসমূহ

১। J. Westland, Esq, C.S ; Report on the District of Jessore ; Its Antiquities, Its History and Its Commerce (second adition) 1874

২। People's Plan of Action, Management of River's in southwest coastal region of Bangladesh ; A Study conducted by Uttaran, Paani Committee, CEGIS and IWM, 2013

৩। Peter Rogers, Peter Lydon, and David Seckler ; Eastern Waters Study, strategies to Manage Flood and Drought in Ganges-Brahmaputra Basin, 1988

৪। একটি ছোট্ট অপারেশন দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলের বহুবিধ সমস্যার সমাধান দিতে সক্ষম ; সম্পাদনা অনিল বিশ্বাস ২০১৩

৫। সতিশ চন্দ্র মিত্র ; যশোর খুলনার ইতিহাস (অষন্ড রূপান্তর সংস্করণ)